## ষষ্ঠ অধ্যায়

## রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 'পাপ ও অমঙ্গলবোধ'

একটি ঘটনা দিয়ে আলোচ্য অধ্যায়টি শুরু করা যাক্। ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের, যখন তাঁর বয়স সতেরোর কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ঘটনার কথা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আলাপ করতে করতে বলেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায়কে, যাঁর ডাক নাম ছিল মন্টু। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত গায়ক, সেকথা আমরা জানি। দিলীপ রায় তাঁর 'তীর্থংকর' গ্রন্থে ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বিধৃত করেছেন।

ঘটনাটি এইরকম : তখন রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন আমেদাবাদে, মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। সেইসময় তাঁর বিলেত যাবার কথা চলছে। বাড়ির সকলে চাইছেন, বিলেত যাবার আগে 'রবি' যেন ইংরাজিতে কথপোথন ও ইংরেজ সমাজের আদব-কায়দা কিছুটা রপ্ত করে নেয়। সেই কাজে সাহায্য করবার জন্যে আমেদাবাদের একটি অভিজাত গুজরাটি পরিবারের বিলেত ফেরৎ বিদুষী কন্যা, তাঁর নাম আন্না তরখড়, রবিকে ঐ ব্যাপারে প্রায় প্রত্যহ তালিম দিচ্ছেন। তরুন রবীন্দ্রনাথের বয়সের চেয়ে আন্না সামান্য একটু বড়ই হবেন হয়ত বা। কিন্তু আন্না কবির রূপে মুগ্ধ, বিশেষত কবির কবিতা শুনে। তরুন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে প্রায়শই আন্নাকে পড়ে শোনাল। সেইসব কবিতা শুনে প্রকৃত অর্থেই আন্না রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে ফেলেন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে, হয়ত বা অজ্ঞাতসারেই। এমনি এক নিভৃত লগ্নে, তাঁরা কেবল দুজনে দুজনের মুখোমুখি, অন্য কেউ নেই তাঁদের কাছে, আন্না কবিকে বললেন : যদি কোন ঘুমন্ত মেয়ের হাত থেকে কেউ তার দস্তানা খুলে নেয়, তাহলে সে তাকে চুম্বন করবার অধিকার

পায়। একথা ব'লে আশ্না চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করলেন এবং মনে মনে অপেক্ষা করে রইলেন - কখন কবি তাঁর হাতের দস্তানা খুলবেন এবং তার বিনিময়ে তাঁকে চুম্বন করবেন। হায়, এক মিনিট দু'মিনিট ক'রে সময় চলে গেল অনেকক্ষন ধরে, কিন্তু কবি না খুললেন আশ্নার হাতের দস্তানা, না করলেন তাকে চুম্বন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে আশ্না উঠে গেলেন। বলা বাহুল্য, গভীরভাবে হতাশ হ'য়ে।

বাইরে থেকে দেখলে, ঘটনাটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর অথবা হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু গভীরভাবে এই ছোট ঘটনার অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য অন্বেষণ করলে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে, তা হ'ল এই - রবীন্দ্রনাথ যে কতো সরল, নিষ্কলুষ ও অনাবিল ছিলেন, উল্লিখিত ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই ছোট একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ও চরিত্রের স্বরূপ স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন, তার অনেকটাই যে উপনিষদের মন্ত্র দ্বারা বিধৃত, তা' আমরা কবির লেখা থেকেই জেনেছি। কিন্তু এই প্রভাব শুধুমাত্র তত্ত্বরূপেই কবির জীবনে সত্য হয়ে ওঠেনি তা কবির জীবনায়নকেও প্রভাবিত করেছিল নিবিড় ভাবে। ফলে পৃথিবীর ও জীবনের সব কিছুই তাঁর কাছে আনন্দময় অমৃতের রূপ বলে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। ফলত, তিনি জীবনের অন্ধকারের দিকে না তাকিয়ে বারংবার আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, আলোর দিকে হাত বাড়িয়েছেন। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে এমনি এক আলোকোজ্জ্বল মানসিকতা গ'ড়ে ওঠার ফলে তিনি জীবনের সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। সচরাচর পাপ ও অমঙ্গল বলতে যা বোঝায়, তা রবীন্দ্রনাথের জীবনে দানা বাঁধতে পারেনি সম্ভবত এই কারণেই ফলত, রবীন্দ্ররচনায় পাপ ও অমঙ্গলবোধের নিদর্শন প্রকৃতপক্ষে প্রায় নেই বললেই চলে।

তবু জীবন জীবনই এবং তা শুধু আলো দিয়ে গড়া নয়, অন্ধকার দিয়েও। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, আনন্দ-বেদনার সমবায়েই গড়ে ওঠে মানুষের জীবন। কোন মানুষের জীবন বিশুদ্ধ সুখে যেমন গড়ে ওঠে না, তেমনি শুধুমাত্র দুঃখ দিয়েও নয়। দিন ও রাত্রির সমবায়ে যেমন একটি দিবস, তেমনি মানুষের জীবনও আলো-অন্ধকারে, পাপে-পুণ্যে গড়া। সুতরাং কেউই তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পারে না তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারে না। এদিক থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তাই সর্বতোভাবে। পাপ ও অমঙ্গলবোধকে পরিহার করে, দূরে সরিয়ে রেখে বেঁচে থাকা অথবা লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেহেতু পূর্বোক্ত বিশিষ্ট ধাতুতে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ও প্রকৃতি গঠিত, তাই তাঁর জীবনে ও লেখায় পাপ ও অমঙ্গলের যে চিত্র পাই, তারও একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। যা হয়তো সাধারণ পাপ ও অমঙ্গল থেকে অনেক পরিমাণেই স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত কথাগুলি থেকে পাপ ও অমঙ্গলসূচক নির্বাচিত কিছু অংশ উল্লেখ করছি।

রবীন্দ্র-কাব্যে "পাপ ও অমঙ্গলবোধ" সংক্রান্ত কবিতার নির্বাচিত একটি তালিকা :

বলাকা

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।

(১ নং কবিতা)

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্ত-মেখে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

(২ নং কবিতা)

যত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার মেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ-দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর মেয়ে।

(৫ নং কবিতা)

আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে
কামানের ধূমে

কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম।

(১৬ নং কবিতা)

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন ওরে উন্না
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে যুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নি-বন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,
... ... ...
বন্ধনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি -
... ... ...
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি, বায়ুকোণে আজিকে ঘনায় -
ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ,
জাতি - অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,

... ... ...

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে,
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে,
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
(৩৭ নং কবিতা)

পরিশেষ

প্রশ্ন

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি - দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি - যে দেখিনু তরুন বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

বীথিকা

বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ,
হেন অপবাদ

যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উচ্চ উচ্চারণে,
ভাবি মনে মনে, ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্ঘাত বেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

প্রলয়

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুছে,
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর,
উদয় দিগন্ত মুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁখি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে,
ভক্তিপাত্র শূণ্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হরে।
মুক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর।

কলুষিত

হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্থানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি

প্রকৃতির সুহস্তের লিখা
আশীর্বাদ - টিকা।
উষা দিব্য দীপ্তি হারা
তোমার দিগন্তে এসে।

পত্রপুট

সতেরো

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

সতেরো

পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।
ওদের এই যাত্রা নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

## সেঁজুতি

### জন্মদিন

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য - অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'।

## নবজাতক

### প্রায়শ্চিত্ত

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড -
বিদীর্ণ হয়ে, তার

কলুষপুঞ্জ করে দিক উদ্ধার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ-নখর
একদিন হবে ঢিলা।

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে। - পাপ ও অমঙ্গলবোধ

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাঁটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস -
মুষ্ঠি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো।

পক্ষীমানব

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে

নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার।

(৩৮ নং কবিতা)

জন্মদিনে

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্ময় এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয় -
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়ের টেনে টেনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

(১৬ নং কবিতা)

রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অস্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে,
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্য সাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।

(২১ নং কবিতা)

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,

মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে -
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

(২১ নং কবিতা)

এর পাশাপাশি সমধর্মী কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

১। 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে ঈশ্বর॥
ওহে অপাপ পুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে -
প্রভু, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া করে লও তুলে॥
আমি জলের আঁধারে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি -
প্রভু, দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও সুধায় হৃদয় ভরি॥

২। তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,

---

১. অখণ্ড গীতবিতান / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা /
প্রকাশ তিনখণ্ড আশ্বিন ১৩৩৮ শ্রাবণ ১৩৩৯ নূতন সং তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ /
পৌষ ১৩৫২ / আশ্বিন ১৩৫৪ / আশ্বিন ১৩৫৭ / পূজা পর্যায় / পৃ.সং - ১৬১ /
গান নং - ৩৯১ /

২. তদেব / গান নং / ৩৯২

তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ, যত দোষ
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ।
তোমার হতে সব সুখ হে পিতা, তোমা হতে সব ভালো।
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমি ভালো সকল ভালোর সার -
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার॥

এখন পূর্বোক্ত কাব্যাংশ গুলি অবলম্বনে পাপ ও অমঙ্গলবোধের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বস্তুত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'বলাকা' কাব্যের আগে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃ পাপ ও অমঙ্গল সম্পর্কে বিশেষ কিছু তাঁর কাব্যধারায় অভিব্যক্ত করেন নি। এর কারণ হয়তো এই যে 'বলাকা' পূর্ব কাব্যধারা মূলতঃ তাঁর নিজের জীবনের অভিব্যক্তি। এই পর্বের কাব্যধারায় কবির সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তা মূলত কবি জীবনকে কেন্দ্র করেই বিধৃত হয়েছিল। হয়তো তারই জন্য কবি যতটা নিজের জীবনের মধ্যে মগ্ন ছিলেন ততটা বাইরের জীবনের দিকে নয়। সন্ধ্যাসংগীত থেকে শুরু করে গীতাঞ্জলি পর্ব পর্যন্ত কাব্যধারায় অন্তর্নিহিত কবি মানসের স্বরূপ যদি জানতে চাই তাহলে দেখবো কবি ধাপে ধাপে একটু একটু করে ক্রমশঃ নিজের অন্তরের মধ্যে মগ্ন হয়েছেন। বাইরের বস্তুগত জীবনপ্রায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেছে। গীতাঞ্জলির মধ্যে পৌঁছে কবি তাঁর জীবনের অভীষ্ট চরিতার্থ করেছেন। - 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' - স্বাভাবিকভাবেই এরকম একটি মানসিক অবস্থার মধ্যে কবির পক্ষে অন্যকোন দিকের দৃষ্টিপাত করা সম্ভব ছিল না। কবি যেন সীমার মধ্যে অসীমকে পাবার জন্যে একাগ্রচিত্তে যাত্রা করেছিলেন, গীতাঞ্জলিতে পৌঁছে সেই পরম পাওয়া ঘটলো। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা

এই পর্বের কাব্যধারায় জীবনের অন্ধকার দিকগুলি দেখতে পাই না। পাপ ও অমঙ্গলের চিহ্ন পাই না।

কিন্তু তারপরেই ঘটেছে পালাবদল। শুধু রবীন্দ্রকাব্যই নয় তৎকালীন বিশ্বজীবনে সেই ১৯১৪ সালে যখন অকস্মাৎ প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হলো তার অল্প কিছুকাল আগে তিনি সি.এফ. এন্ড্রুজকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর বিশ্বব্যাপী আসন্ন অমঙ্গলবোধের দুর্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর কবির সেই আশংকা ও বিশ্বজীবনের অমঙ্গলবোধ যখন সত্যিই যুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো তখন কবি সেই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বলাকা কাব্যের ২ থেকে ৫ সংখ্যক, ১৬, ৩৭ এবং ৪৫ সংখ্যক কবিতায় স্পষ্টতই পাপ ও অমঙ্গলের ভাবনা সূচক প্রকাশ লক্ষ্য করি। কবি বলেছেন যে বহু যুগ ধরে এই পাপ বিশ্বজীবনে সঞ্চিত হয়ে চলছিল অবশেষে তা প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের নগ্নরূপের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ কবির বক্তব্য এই যে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত পাপ থেকেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের জন্ম। কবির এই অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে ৩৭ নং কবিতায়। যেখানে তিনি বলেছেন -

'দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে,

কবি আরো স্পষ্ট করে বললেন -

'এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ

যখন বলাকার কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল তখন মহাযুদ্ধের আগুন ইউরোপে তথা বিশ্বজীবনে ছড়িয়ে পড়ছে। যে কবি অব্যবহিত পূর্বেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, বিশ্বের দ্বারে দ্বারে আমন্ত্রণ পেয়েছেন, সেই কবির পক্ষে বিশ্বমানবের জীবনে গভীর অমঙ্গলের আশংকা অনিবার্য ভাবেই দেখা দিয়েছিল। এই অমঙ্গলবোধও তাই বলাকার নানান কবিতায় ক্ষনে ক্ষনে দেখা

দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সব সময় জীবনের প্রতি বিশ্বাসী সেই জন্যই তিনি তাঁর আশংকার মধ্যেও বিশ্বমানবজীবনের কল্যানের কথাই ভেবেছেন। বলাকার সর্বশেষ ৪৫ সংখ্যক কবিতায় তারই অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি।

অতঃপর বলাকা থেকে শেষ লেখা অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ এই পর্বের কাব্যধারায় আমরা কবির এই পাপ ও অমঙ্গলবোধের আরো কিছু অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত বলাকায় যার সূত্রপাত পরবর্তী কাব্যধারায় কবির সেই পাপ ও অমঙ্গলবোধ যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর রূপ নিতে নিতে এগিয়ে চলেছে। এই সূত্রে বলাকার পরেই পরিশেষ কাব্যের 'প্রশ্ন' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবানকে সামনে রেখে কবি যে প্রশ্ন করেছেন সে প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে একেবারে নতুন। আগেকার কাব্যধারায় জীবন সম্পর্কে কবিকে নানাভাবে প্রশ্ন মনস্ক হতে দেখা গেছে। কিন্তু এই কবিতায় যে প্রশ্ন সে প্রশ্ন আগের মতো নয়। এই কবিতাটিতেই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম কবি সরাসরি স্বীকার করেছেন যে তিনি জীবনের শুধু আলোর দিকটিই না অন্ধকারের দিকটিও দেখেছেন। এবং তারই বেদনায় বেদনার্ত কবি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করেছেন :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পরিশেষের পর এই ধরনের আরো কিছু প্রকাশ বীথিকা, পত্রপুট, সেঁজুতি, নবজাতক, রোগশয্যায়, জন্মদিনে, কাব্যগ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি। এই কাব্যগুলির প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলির অংশ বিশেষ আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই সব কবিতায় যা লক্ষ্য করার তা হচ্ছে এই যে এই কবিতাগুলি কোন না কোন ভাবে পরবর্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লিখিত। এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পত্রপুট কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতাটি। যেখানে কবি মানুষের তথা যুদ্ধের ভয়ংকর রূপটি তুলে ধরেছেন। এই কবিতায় যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তার একদিকে আছে 'যুদ্ধের দামামা' অন্যদিকে আছে 'পিশাচের

অট্টহাসি'। ঠিক একইভাবে সেঁজুতি কাব্যের জন্মদিন কবিতায় 'মানুষ জন্তুর' কথা বলেছেন। অথবা ধরা যাক, নবজাতক কাব্যের প্রায়শ্চিত্ত কবিতার কথা। যেখানে কবি 'পাপের এ সঞ্চয়'-এর কথা বলেছেন। এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতা আছে। দেখা যাচ্ছে, নবজাতক কাব্যের পরেও কবির এই বোধ আরো কিছু দূর পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কবি অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রত্যাশা করেছেন যে একদিন এই পাপ ও অমঙ্গলের অবসান ঘটবে।

এ কুৎসিত যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম শয্যা তলে এসে
নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে -
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

(২১ নং কবিতা জন্মদিনে)

রবীন্দ্রকাব্যধারায় বিধৃত কবির পাপ ও অমঙ্গলবোধের যে চিত্রটি আমরা দেখতে পেলাম তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কবির এই পাপ ও অমঙ্গলবোধ কোন ব্যক্তিগত বা বিশেষ জীবনকে কেন্দ্র করে নয় তা দানা বেঁধেছে বিশ্বজীবনকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাপ ও অমঙ্গল সম্পর্কে কবির বোধ কোন ব্যক্তিজীবন থেকে উঠে আসেনি। তা গড়ে উঠেছে বিশ্বজীবনকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রকাব্যে বিধৃত কবির পাপ ও অমঙ্গলবোধের এইটিই মূল কথা। এই বোধ যদি কোন ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো তাহলে হয়তো আমরা পাপ ও অমঙ্গলের একটা বস্তুগত চিত্র দেখতে পেতাম। কিন্তু তা হয় নি। যেহেতু এই বোধ সর্বজনীন বিশ্বজীবনের সঙ্গে গ্রথিত সেই কারনেই সম্ভবতঃ তা অনেকাংশে নির্বস্তু বা

Abstract রূপে দেখা দিয়েছে। কাব্যে বিধৃত রবীন্দ্রনাথের পাপ ও অমঙ্গলবোধের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আশ্চর্যের বিষয়, পাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অনেক নাটকে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেমন বলেছেন এডওয়ার্ড টমসন, - তাঁর নাটকগুলি কোন না কোন ভাবে এক একটি চিন্তার বা ভাবের বাহন। অর্থাৎ বিশেষ একটি বক্তব্য রূপায়িত হয়েছে তাঁর নাটকে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন - জীবনের একদিকে আছে ন্যায় বা প্রেমধর্ম। অন্যদিকে আছে অন্যায় বা হিংসার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ পাপ বলতে বুঝিয়েছেন এই অন্যায় বা হিংসাকে। এবং দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে অন্যায় বা পাপ সত্যের কাছে পরাভূত হয়। এই বক্তব্যের বা ভাবাদর্শের অনুকূলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন।

কিছু নির্বাচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক্ 'বিসর্জন' নাটকের কথা। এই নাটকের একদিকে আছে গোবিন্দমাণিক্য। যার আদর্শ প্রেম। অন্যদিকে রয়েছে রঘুপতি। যার আদর্শ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। জয়সিংহ তার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে রঘুপতির চেতনাকে জাগ্রত করে। রঘুপতি তাঁর ভ্রান্ত হিংসার ধর্মকে ত্যাগ করে। এবং এইভাবেই গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের ধর্ম বা ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিংবা ধরা যাক 'মুক্তধারা' নাটকের কথা। এই নাটকের একদিকে আছে উত্তরকূটের বিশ্বজিৎ, বিভূতি। যারা শক্তির দম্ভে মুক্তধারায় বাঁধ বেঁধে শিবতরাইয়ের মানুষকে জল না দিয়ে মারবার ফন্দী করেছে। অন্যদিকে আছে উত্তরকূটেরই রাজপুত্র যে এই হিংস্র শক্তিকে মেনে নিতে পারে নি। অবশেষে সে তার নিজের প্রান দিয়ে মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে তার ধারাকে মুক্ত করেছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে হিংসা বা পাপ মানব প্রেমধর্মের কাছে পরাভূত হয়েছে। কিংবা ধরা যাক্ - 'নটীর পূজা' নাটকটির কথা।

অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের অহিংসা ও তাঁর প্রেমের ধর্মকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল এবং তার জন্য নগরে নিষিদ্ধ হয়েছিল বুদ্ধের আরতি। নটীর শ্রীমতি এই অন্যায় মেনে নেয় নি, এবং নিজের প্রাণ দিয়ে সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। এখানেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমের বা ন্যায়ধর্মের আদর্শ কে তুলে ধরেছেন। এই অন্যায় বা পাপের বিরুদ্ধে সত্য বা প্রেমের জয় কত সুন্দর ভাবে চিত্রিত হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে রক্তকরবী। নেপথ্যবর্তী রাজাকে কেন্দ্র করে সর্দারের দল যে মানুষ মারার অথবা মনুষ্যত্ব নিধনের আয়োজন করেছিল তার মর্মমূলে আঘাত করেছে নন্দিনী। নন্দিনী যক্ষপুরীর বন্ধ হাওয়া থেকে মুক্ত করার জন্যে বারম্বার আহ্বান করেছে, রাজাকেও বলেছে 'রাজা, তুমি বেড়িয়ে এস, কিন্তু সর্দাররা নন্দিনীর এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। অবশেষে রঞ্জনের প্রাণ বিসর্জন ঘটিয়ে নন্দিনীকেও সেই পথে এগিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যক্ষপুরীর রাজাকে বের করে আনলেন। রাজা তাঁর নিজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে এসে ধ্বজাদন্ড ভেঙেঁ ফেললেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন রঞ্জন ও নন্দিনীর আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে কীভাবে ন্যায়ধর্ম অন্যায় বা পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই বিষয়টি আর একভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের মধ্যে দেখতে পাই। মিথ্যার ছলনা দ্বারা অর্থাৎ পাপের পথে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে পেতে চেয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত ছলনার আবরণ সরিয়ে দিয়ে চিত্রাঙ্গদা আপন স্বরূপে অর্জুনের কাছে ধরা দিয়েছে। অর্জুন বলেছেন, 'ধন্য ধন্য আমি'। একইভাবে 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রকৃতি-পাপের পথে আনন্দকে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আত্মগ্লানিতে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত আনন্দের ক্ষমা ও প্রেম লাভ করেছে। এখানেও দেখি পাপের পরাজয় ঘটেছে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে পাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বোধ আরো স্পষ্টত হয়ে ফুটে উঠেছে। বজ্রসেনকে পাওয়ার জন্য শ্যামা পাপের পথ গ্রহণ করেছিল। বজ্রসেন যখন সেই পাপ অর্থাৎ উতীয়ের আত্মবিসর্জনের কথা জানতে পারলো তখন সে শ্যামাকে ধিকৃত করে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলো। শ্যামা

বজ্রসেনকে পেল না। বজ্রসেন শ্যামাকে দূরে সরিয়ে দিল বটে কিন্তু শ্যামার প্রেমকে ভুলতে পারলো না -

৩। বজ্রসেন । কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে - ভাঙিবে কলুষ নীড় বজ্র-আঘাতে।।
শ্যামা । হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত -
হোক বিধাতার হাতে নিদারুনতর।
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।।
বজ্রসেন । এ জন্মের লাগি -
তোর পাপ মূল্যে কেনা মহাপাপ ভাগী -
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত ।
কলঙ্কিনী, ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী
কলঙ্কিনী।।
শ্যামা । তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ - সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া সবে না, সবে না, সবে না।।
বজ্রসেন । তবু ছাড়িবি নে মোরে ?
শ্যামা । ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না
তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না। ...

---

৩. শ্যামা নৃত্যনাট্য / পৃষ্টা সংখ্যা - ৭৪৭ / ১ - ২ তদেব /

... ... ...

বজ্রসেন । ক্ষমিতে পারিলায় না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজন শরণ প্রভু !
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা-
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু !
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিণতা
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥

এখানে দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে বজ্রসেনের মাধ্যমে শ্যামার পাপকে ধিককৃত করেছেন। কিন্তু তার প্রেমকে অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে প্রেমের মতো মহৎ কিছু পেতে গেলে মহৎ পথ অবলম্বন করতে হবে পাপের পঙ্ক নয়। শ্যামা সেই পাপের পথে তার প্রেমকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল বলেই অবমানিতা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকে নির্বাচিত কিছু দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে পাপ সম্পর্কে তার ধারণাটি তুলে ধরা গেল। দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় নাট্যকারদের তুলনায় পাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। ধরা যাক্, শেক্সপিয়ার-এর নাটকের কথা। ম্যাকবেথ, ওথেলো যে মৃত্যুবরণ করেছে তা আসলে তাদেরই কৃতকর্মের অর্থাৎ পাপের ফল। অর্থাৎ তারা যে অন্যায় বা পাপ করেছিল অপর নিষ্পাপের মৃত্যু ঘটিয়ে তারই প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন পাপীকে তার পাপের পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য একজন নিষ্পাপের আত্মবলি প্রয়োজন। অর্থাৎ পাপকে প্রতিহত করবার জন্যে, পাপের উপর সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, একজন নিষ্পাপের আত্মবিসর্জন দরকার। এইভাবেই

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাপ সম্পর্কে ধারণাটি অভিব্যক্ত করেছেন।

এর পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের দুটি মহাকাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে তার ভিতর থেকেও পাপ সম্পর্কে ভারতবর্ষের ধারণা কি তা উঠে আসে। এই দুটি মহাকাব্যের দুটি বৃহৎ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সেই যুদ্ধ কেন ? তার কারণ কি ? তার কারণ একটি রাবণ বা দুর্যোধন পাপ করেছিল। এই পাপের ফলে তাদের ধ্বংস হয়েছে। বস্তুত এইভাবেই অন্তত স্পষ্ট করে এই অমর দুটি মহাকাব্য আমাদের সামনে পাপ সম্পর্কে ভারতবর্ষের ধারণাটি তুলে ধরেছে। বলা যেতে পারে পাপ সম্পর্কে যে সব ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছে বা যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তিভূমি এই দুটি মহাকাব্য। আমরা জানি ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে এবং জীবনাদর্শের মধ্যে এই দুটি মহাকাব্যের প্রভাব কী অপরিসীম। একথা অনুমান করা চলে যে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি মহাকাব্যের পাঠক হিসেবে এই পাপ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং পাপের অস্তিত্ব যে একটি বাস্তব ব্যাপার তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অজানা ছিল না বা থাকার কথাও নয়। তথাপি তিনি এই ঐতিহ্যপূর্ণ ধারণার পাশ কাটিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পাপ সম্পর্কে একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে নিতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা তত্ত্বগত দিক থেকে আর একবার পাপ ও অমঙ্গলবোধের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি যে পাপ থেকেই অমঙ্গলের জন্ম। অর্থাৎ পাপের ফল অমঙ্গল। রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন পাপ বলতে তিনি যে ধারণাটি গড়ে তুলেছেন, যে কথা আমরা আগে বিশ্লেষণ করেছি দৃষ্টান্ত দিয়ে, তা হচ্ছে এই, যে মুহূর্তে আমরা আংশিকের প্রতি আসক্ত হয়ে সমগ্রের অবমাননা করি সেই মুহূর্তেই আমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হই। এবং পাপের মধ্যে লিপ্ত হই। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, পাপ হচ্ছে একদিকে সত্যের অবমাননা অন্যদিকে অংশের প্রতি আসক্তি। মানুষ যখন বিশেষ কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেয় বা আসক্ত হয় তখন

সে সমগ্রকে দেখতে পায় না বা সমগ্রের কথা মনে রাখে না। এই যে সমগ্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, এইটিই হচ্ছে অসত্য। অর্থাৎ পাপ। সত্য হচ্ছে সমগ্রের প্রতি নিষ্ঠা। আর অসত্য বা পাপ হচ্ছে অংশের প্রতি আসক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে এই হচ্ছে পাপ এবং পাপ থেকেই অমঙ্গলের সৃষ্টি। ব্যক্তি হিসেবে একজন মানুষ এই পাপ করতে পারে এবং তার ফলে তার ধ্বংস হতে পারে। যেমন রাবণ অথবা দুর্যোধন। আবার সমগ্রভাবে একটি দেশ যখন সমগ্র মানব সমাজের কথা না ভেবে নিজের দেশের মানুষের স্বার্থের কথা ভাবে তখনো সে পাপ করে, তার দৃষ্টান্ত বিশ্ব মহাযুদ্ধ। পাপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেসব চিত্র তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন তারও মূল কথা এই। কিন্তু পাপ সম্পর্কে একথা ব্যক্ত করার পরেও রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত আর একটি কথা বলেছেন। যেকথা অন্য কোথাও বলা হয়নি। সাধারনতঃ দেখা গেছে পাপী নিজেই তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন পাপীকে শুদ্ধ করা দরকার। পাপ থেকে মুক্ত করা দরকার। তার জন্য প্রয়োজন একজন নিষ্পাপের আত্মাহুতির। খুব সম্ভবত এর পিছনে যীশুখ্রীষ্টের জীবনাদর্শের প্রভাব রয়েছে। কারণ তিনি বলেছিলেন - 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।' রবীন্দ্রনাথ হয়তো অজ্ঞাতসারে এই আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তারই ছায়ায় তাঁর দৃষ্টিভংগীতে পাপ সম্পর্কে ধারণাটি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। ধম্মপদে পাপ সম্পর্কে যেকথা বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার অনুবাদ করেছেন এইভাবে :

ধম্মপদং

(রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)

পাপবগ্গো নবমো

পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্পুনং।
ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ দুখ্খো পাপস্স উচ্চয়ো ॥২॥

অনুবাদ

যদি কেহ কখন পাপ করে, তবে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ না করে, যেন তাহাতে আসক্তি প্রকাশ না করে (কারণ) পাপসঞ্চয়, দুঃখকর।

যো অপ্পদুট্ঠস্স নরস্স দুস্সতি সুদ্ধস্স পোসস্স অনঙ্গনস্স।
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং সুখুমো রজো পটি বাতং ব খিত্তো॥১০॥

অনুবাদ

যে নির্দোষ, শুদ্ধ, এবং নির্মল ব্যক্তির নিন্দা করে, বায়ুর বিরুদ্ধ দিকে ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় পাপ তাহারই নিকট আসে।

সুতরাং এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে পাপ ও অমঙ্গলবোধ সম্পর্কে ধারণাটি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

সবশেষে, পাপ ও অমঙ্গল সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বোল্লিখিত সূত্র ধরে শ্রী শঙ্খ ঘোষের আলোচনা থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

৪. 'জীবনের শেষ পনেরো বছরে তরুনতর যে লেখকদের সমীপতায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁরা এক নূতন আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ঠিকই, সেখানে ছিল পাপ আর দুঃখের ভার, যৌনতা বা অমঙ্গলের প্রতাপ, অথবা বিশেষ ধরনের এক মননজাত অভিজ্ঞতার জট। কিন্তু ভুল হবে একথা ভাবলে যে তাঁদের অনুসৃত সেই পথই ছিল আধুনিকতার একমাত্র চরিত্র। একথা যে কেবল আমাদের দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য তা নয়, সমস্ত দেশের পক্ষেই অল্পবিস্তর সত্য এইকথা। এই কথা যে, 'আধুনিকতা' আর 'আধুনিকতাবাদ' এর মধ্যে আছে ভিন্ন দুই রূপ, একেবারে সর্বসম নয় এ দুই ধারণা।'

---

৪. নির্মান আর সৃষ্টি / শঙ্খ ঘোষ / রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন / ২২শে শ্রাবণ ১৩৮৯ / ভূমিকা / পৃ·সংখ্যা - ১০-১১ /

## উল্লেখপঞ্জী

১. গীতবিতান / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. নির্মাণ আর সৃষ্টি / শঙ্খ ঘোষ